International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
*Volume-II, Issue-*VIII*, September 2016, Page No. 7-18*
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র কবিতায় ঈশ্বরপ্রসঙ্গ : একটি প্রতিবেদন

সুস্মিতা চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, এস. কে. রায় কলেজ, কাটলিছড়া, আসাম, ভারত

Abstract

Alokeranjan Dasgupta (born on October 6, 1933) is a poet well-known for his thematic and technical innovations, variety of subject-matter, vast knowledge, and an ever expanding wide sweep of interest and inquisitiveness. Amidst his ever-transforming themes, however, stands one constant: God. His faith in God has been steadily reflected in scores of poems. But, being a poet surrounded by a modern barren Godless world, he tends to introspect on and scrutinize his own faith in or relationship with God. Almost every new book of his poetry exhibits the multiplicity of expression of that one WHOLE TRUTH, that constant but outwardly protean existence pervading his essential universe. Readers usually discover in his poetry an amazing coexistence of such divergent ideas as faith, atheism, agnosticism, Marxism, etc. His poetical universe, thus, has been developed out of a very subtle and sensitive matrix. The present paper tries to focus on how Alokeranjan weaves his poetical garland out of these varying and varied elements steeped into the depths of his poetic sensibility, and how he tries to balance and concretize them or blur them out of recognition in his poetry.

Keywords: Faith in God, Existence, Multiplicity, Atheism, Coexistence of contraries, Balance.

অখণ্ড সত্যের বহুমাত্রিক প্রকাশ-কে, বোধের গভীরতর স্তরে, কবিমানসজাত জটিল রসায়নে জারিত করে, মেধাবী তথা মরমী কথকতার কাব্যমালা রচনা করেছেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত । ঈশ্বর-সত্ত্বা ও মানবলোকের বিচ্ছেদ ও মিলনের যে সূক্ষ্মতর আবছায়ালোকটি আছে, তাকে তিনি ভীষণভাবে জীবন্ত ও স্পর্শাতুর করে তুলেছেন তাঁর কবিতায় । ঈশ্বরে নির্ভেজাল আস্থা হতে ক্রমশ প্রশ্নমুখর অনাস্থার দেহলীস্পর্শ করেও, আজন্মব্যাপী অভ্যাসবশত, ঈশ্বরস্তুতি জড়িত বিজড়িত হয়ে আসে তাঁর কবিতায় । তাঁর নিজের ভাষায় –

> আমার প্রথম কবিতার বই 'যৌবনবাউল' বেরোয় ১৯৫৯-এ । এই বইতে আমার ঈশ্বরবিশ্বস্ততা প্রকাশ পায় প্রত্যক্ষকথনের ধরনে । 'বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে'–আমার এই সম্বোধন সরাসরি ঈশ্বরের প্রতি। যখন এর পর প্রায় এক দশকের ব্যবধানে, 'নিষিদ্ধ কোজাগরী' (১৯৬৮) প্রকাশিত হয়, কোনো-কোনো সমালোচক আমাকে 'অনাস্থাবাদী' 'নাস্তিক' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অলংকৃত করতে থাকেন । তারপর যখন প্রায় এক বছরের মধ্যেই 'রক্তাক্ত ঝরোখা' (১৯৬৯) প্রকাশিত হল, তারা অনেকেই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন ; বিশেষ করে যাঁরা আমাকে একধরণের একায়তনিক ঈশ্বরের দূত বা 'দালাল'

> হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁদের কথাই বলছি । এঁরা দেখতে চাননি যে আমি সেদিন বিশ্বাস ও বিতর্কের প্রতীতি আর পরিপ্রশ্নের একটি জটিল জালায়ন রচনা করতে চেয়েছিলাম । আমার কবিতায় এঁরা খুঁজেছিলেন সুপ্রিয় একটি সারাংশ । তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন আমি একটি একধাতব মানুষ এবং আমার কোনো অধিকার নেই নানাভাবে নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে বাজিয়ে নিতে । [i]

তাঁর লিরিকধর্মী কবিতাসমূহে ঈশ্বরভাবনা বিচিত্ররূপে ও বহুরৈখিক প্রেক্ষিতে অন্যতম শর্ত হিসেবে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে । একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন –

> ...ঈশ্বরকে আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি । তারপর ... বৈষ্ণব কবিতা পড়ে, এমনকি উপনিষদ পড়েও ব্যাপারটা ঘটেছিল, মানতেই হবে, যে ঈশ্বর আমাদের জীবনে কতটা জরুরি সংযোজন । 'তাই আমার আনন্দ আমার পর' – ঠিক নয়। আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল কম্বুরেখ সিঁড়ি বেয়ে ঈশ্বরের দিকে ওপরে ওঠার চেষ্টা । পরে একসময় মনে হয়েছিল ঈশ্বর নেই, একটা স্বপ্ন আছে । আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ উপলব্ধিটা তৈরী হল, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মেলামেশার পর্ব থেকে ক্রমশ যেটা বেরিয়ে এল, ঈশ্বর আছেন কি নেই সেটা আমি জানি না। কিন্তু আমার কবিতায় ঈশ্বর একটি শর্ত হিসাবে থেকে যান । [ii]

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন কবিবন্ধুদের বিদ্রূপ কবি গায়ে মাখেন না। কারণ, তাদের মানসলোক তমসাচ্ছন্ন । তাই ঈশ্বরের বার্তা অতিক্ষীণভাবে তাদের কর্ণগোচর হলেও 'মাঝে-মাঝে সামনে গিয়ে পিছু / ফিরে এসে বলে ওরা শোনে নি দূরের শব্দ কোনো' [iii]। সমস্ত সংশয়ে-সংকটে কবি ঈশ্বরকেই আঁকড়ে ধরতে চান । ঈশ্বরই তাঁর কাছে আশ্বাসপ্রদানকারী প্রিয়বন্ধুস্বরূপ । তাঁর ঈশ্বরপ্রত্যয়ী মন ঘোষণা করে যে, তিনি যদি কখনও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হোন তবে বন্ধুরা যেন ঈশ্বরকেই নিরীশ্বর বলে বিদ্রূপ করে । পাঠকের মনে তখন প্রশ্ন জাগে যে, অখণ্ড আস্তিক্যবোধে অবিশ্বাসের কোনও স্থান আছে কি ! প্রকৃতপক্ষে, কবি যেন অপ্রচলিত পন্থানুসারে তাঁর ব্যক্তিগত ঈশ্বরভাবনা বয়ন করে চলেছেন এই কবিতায় । এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে তাঁর আত্মসমীক্ষণের মুহূর্তচয়ন । ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে বলা যায় –

> The beauty of Hinduism is that the concept of God is tried to be understood, experienced. There are Puranas that elaborately tell through the voice of the divines the glory of God. These are one part. On the other hand the scriptures like Upanishads analyze through questioning and reasoning the concept of God. These two types go very much hand in hand. [iv]

উপরিউক্ত দ্বিতীয় পথ অনুসারী অলোকরঞ্জন তাঁর ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে নিজের মতো করে, ভালোবেসে সন্ধান করতে চান এবং তিনি উপনিষদ বর্ণিত পন্থায় তর্ক-বিতর্ক, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মার্গ অতিক্রম করে মনুষ্যবৃত্তিসমৃদ্ধ ঈশ্বরকে তাঁরই সৃষ্ট প্রতিটি অস্তিত্বে অনুভব করতে চান । নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তাশীলতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রত্যয়ের সঙ্গে সুমিশ্রিত হয়ে আছে অলোকরঞ্জনের ঈশ্বরভাবনা –

> যদি কথা বলে উঠি যদি গান গেয়ে উঠি,
> ক্ষমা কোরো, স্থির ভগবান ।। [v]

স্বাধীনতা-উত্তর কালে, কবির প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার স্বরূপ বহিরঙ্গেই সংকুচিত হয়ে এসেছিল । সেজন্যই, তাঁর ঈশ্বরীয় ভঙ্গিটি তাঁর ঐশী প্রতীতি থেকে আলাদা করতে না পারলেও, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইচ্ছাতেই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণটি তাঁদের নিঃশর্ত হতে পারেনি ।

আবার দিব্যত্ব অন্বেষণকারী অলোকরঞ্জন দেহজ সীমায়নের ঊর্ধ্বে 'সূর্যনাভ ঈশ্বরের' পাশে 'সমধর্মী বন্ধু'-র মতো দাঁড়াতে চেয়েছেন 'শরীর ফুরিয়ে গেলে' কবিতায়। অমৃতময় তাঁর দেহ তখন 'মেদুর চন্দন/ সূর্যের জ্যোৎস্নার মতো ধুয়ে দেবে আকাশপাতাল'। [vi] 'সূর্যের জ্যোৎস্না' শব্দবন্ধের আপাতবিরোধিতায় যে চমৎকার প্যারাডক্সের খেলা তার দ্বারা কবি সম্ভবত মহাজগতে পরমাত্মার সঙ্গে দেহাত্মার মরমিয়া পরিণয়ের মাধ্যমে যে জ্যোতির প্রকাশ হবে, তা সূর্যালোকের মতো তেজোময় অথচ চন্দ্রালোকের মতো স্নিগ্ধ হবে বলে ইঙ্গিত করছেন। এ যেন রাধা ও কৃষ্ণের একীভূত হয়ে যাওয়া, যেখানে ভক্ত ও ঈশ্বরের মধ্যে 'ক্ষমাহীন দেহান্তরাল' মুছে যায়।[vii] এভাবেই ব্যক্তিত্বের পুনর্বিন্যাসে, অন্তরের গভীরতর কোরকে, অসীমের সঙ্গে সসীমের মিলন হয়।[viii] ঈশ্বরপ্রেমে আত্মবিলোপের মাধ্যমে কবি

'...স্পর্ধাঋজু ধূপের মতন / তর্জনী আঙুলটারে সূর্যে রেখে' পোড়াবেন...[ix]

এই কবিতায় অলোকরঞ্জন ফার্সি কবিদের মতো ঈশ্বর ও প্রেয়সীকে এক করে দেখেছেন, - ঠিক যেভাবে বৈষ্ণব পদাবলীতে ঈশ্বর ও ভক্তকে প্রিয় ও প্রিয়ার মতো কল্পনা করা হয়েছে।

"যৌবনবাউল" কাব্যের 'একটি শবযাত্রা' কবিতায় পাঠক অলোকরঞ্জনকে ঈশ্বরহীনতায় ব্যথিত হতে দেখেন। কিন্তু একায়তনিক ঈশ্বরত্বে তিনিও বিশ্বাসী নন। তাই তিনি 'কী বলতে হবে, কী করে বলতে হবে' কবিতায় প্রশ্নাতুর হন, যখন দেখেন অচলায়তনের অন্তিম শৃংখলে বাঁধা পড়ে যায় ঈশ্বর অন্বেষণের আলোক রেখা। এই কবিতায় 'অচল হিমার্ণব' বলতে সম্ভবত আনুষ্ঠানিকতা এবং বস্তাপচা বদ্ধধারণা আর কিয়দংশের-হাতে-শৃংখলিত তথাকথিত ভক্তির আরাধনাকেই বুঝিয়েছেন কবি। তাই -

'ঈশ্বর নেই' হাওয়া দেয় টিটকারি !
'ঈশ্বর নেই' দিগন্তবিস্তারী
কালো হাওয়া ঘোরে ;[x]

কিন্তু ঈশ্বর আছেন মানুষের মাঝে - মায়ের স্নেহ চোখে আর দয়িতার পাশে দাঁড়ানো দয়িতের ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়েও তিনি আছেন। এ তো সেই ঈশোপনিষদের কথারই পুনরুক্তি -

> Each body, each mind, each faculty of body or mind, each physical and mental act belongs to a single, divine presence that is called 'God'. That one presence lives in each personality. It rules each personality from deep within, beneath all outward names and forms and qualities.[xi]

কবি জাগতিক আনন্দ বেদনায়ও ঈশ্বরকে খুঁজে পান। তাই যখন তিনি বলেন 'ঈশ্বরের সঙ্গে এক বিছানায় শুলে / অনাচারী নাম যদি রটে রটুক,'[xii] তখন একে দিব্যত্বে উদ্ভাসিত হবার একটি মুহূর্তের উৎসারণ বলেই মনে হয় - কোনও জৈব আবেগে ভক্তিরস সঞ্চারের ইচ্ছা বলে তো মনে হয় না - এ যেন 'প্রবৃত্তি থেকে স্বভাবে, স্বভাব থেকে স্বরূপে তাঁর নিঃসীম যাত্রা,'[xiii]। আসলে সমাজের প্রাসাদে নয় বরং হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ভক্তিরসের মন্দিরেই অলোকরঞ্জন ঈশ্বরকে সর্বদা অনুভব করতে চেয়েছেন।

> "নিষিদ্ধ কোজাগরী"-তে সমালোচক (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার) লক্ষ্য করেন যে এ বইয়ের কোনো কোনো 'কবিতায় ঈশ্বরত্বকে আঘাত হানার ইচ্ছে প্রণিপাত করেছে মনুষ্যত্বের দরজার সামনে'। ... বইটি পড়ে অনেকেই তাঁকে নাস্তিক ভেবে ক্ষুণ্ন হন।[xiv]

'ঈশ্বরের প্রতি' কবিতায় অলোকরঞ্জন অভিমানী হৃদয়ে যুগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হতে হতে ঈশ্বরকে অনুযোগ করে বলেছেন, যতই ঈশ্বর মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিন না কেন, যতই তাঁর অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিবিধ কৌশল রচনা

করুন না কেন, জোর করে কবিকে দীক্ষিত করতে চান না কেন, বা প্রেমিকের স্বাভাবিক গভীরতাকে নষ্ট করুন না কেন, যতই ঘরণীর সিঁথি পরে অবৈধতা করুন না কেন, কবির করপুটে এখনও বিশ্বাসের জল আছে - এই বিশ্বাসের জল পান করে ঈশ্বর যেন নিজ অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন, তবু হয়তো জগতের মঙ্গল হবে, কবি নাহয় জল-তৃষ্ণায় আত্মত্যাগ করবেন। কারণ, বিশ্বাসশূন্য পৃথিবী বিশ্বাসবারিসিঞ্চনেই তো উর্বরা হবে। এই কবিতায় কবিকে আমরা নাস্তিক (atheist) হিসেবে নয় বরং তাঁর ভাব ভঙ্গিমায় 'Dover Beach' কবিতায় ইংরেজ কবি ম্যাথ্যু আর্নল্ডের জগৎ জুড়ে বিশ্বাসহীনতার যে দুঃখবোধ-এর প্রকাশ তারই একটি প্রচ্ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।

The sea of Faith
Was once, too, at the full and round earth's shore
Lay like the folds of a bright girdle furl'd.
But now I only hear
Its melancholy, long, withdrawing roar,
Retreating, to the breath
Of the night-wind, down the vast edges drear:
And naked shingles of the world. [xv]

বিশ্বাস-সমুদ্রে ভাঁটার টানে নগ্ন পাথুরে বিশ্বাসহীনতার গ্লানিতে ব্যথিত দুই দেশের দুই কবিমন। তাই দেখা যায় কবি অলোকরঞ্জন ঈশ্বরকে ভুলতে বসা এই পৃথিবীকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্মরণ করানোর জন্য মাঝে মাঝে স্পষ্ট করে বলতে চান যে তাঁর সাধনার ধন ঈশ্বর এখনও আছেন। কবি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে উচ্চারণ করেন,

তুমি চলে গেছ বলে আমাকে গাহন করাবার
কেউ নেই, যত্রতত্র সেরে নিই মধ্যাহ্নভোজন ।। [xvi]

পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের অবমূল্যায়নে, বিবেকহীনতার যন্ত্রণায়-ই কি ঈশ্বর মনুষ্য-সঙ্গ ত্যাগ করেছেন ?! প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অরাজকতার অন্ধকারে মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হয়ে এসেছিল। তখন যুগের প্রভাবে ডব্লু বি ইয়েটস্-এর মতো কবিও তাঁর 'Second Coming' কবিতায় দ্বিতীয় বারের জন্য যিশুখ্রিস্টের পৃথিবীতে আবির্ভাবের আশা নয় বরং আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন ; তাঁর আতঙ্কগ্রস্থ দুঃস্বপ্নে তিনি মানবকল্যাণহেতু-আগত কোনও ঋষি-যিশুকে দেখতে পাননি, দেখেছেন অর্ধমানব-অর্ধপশু এক ভয়াল জীব-কে। এক্ষেত্রে অলোকরঞ্জনের স্বতন্ত্র অবস্থান তাই লক্ষণীয়। অলোকরঞ্জন অত্যন্ত আটপৌরে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাঁর আশা। কিন্তু সেই একই ভাবনায় অর্থাৎ পৃথিবীতে সারল্য ও বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বরের পুনরুত্থান কামনা করতে পারেননি ইয়েটস্।

'The Second Coming'
Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.
Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out

When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: a waste of desert sand;
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Wind shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again but now I know
Twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born? [xvii]

যে কাব্যের বিভাব কবিতায় এমন পংক্তি আছে –

এবং ভগবানের দোহাই
চিত্রিত কাঁচুলি জুড়ে বিশ্বভুবন দেখতে দেখতে
আমি সেদিন বলেছিলাম 'আল্লা মেঘ দে' 'আল্লা মেঘ দে' ;

সেই "রক্তাক্ত ঝরোখা" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অলোকরঞ্জনকে প্রচলিত ঈশ্বরবিশ্বাসী হিসেবে না পেয়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু অলোকরঞ্জন অকপট – তাঁর বিষয়বস্তু 'ঈশ্বর' বলতে আজ তাঁর মনে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ, কারণ ঈশ্বর বললেই অনীশ্বর নরকের গলি তাঁর মনে পড়ে, সন্ন্যাসীর সমর্পিত বিশ্বাস তাঁর আজ আর নেই। মন্দিরে, গির্জায় যখন কেবলমাত্র পোশাকি সাজসজ্জা আর আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের পর্ব চলে তখন ঈশ্বর কোথায় যেন হারিয়ে যান – তবু বিশ্বাস হারাতে হারাতেও কোথায় যেন আজন্ম-লালিত সেই বিশ্বাস কবিকে হতবাক করে, মুহূর্তের উন্মীলনে, ফিরে আসে –

এসব চরিত্রছবি আমার হৃদয়রক্ত লেগে
ঘূর্ণিযোগে অবশেষে ঈশ্বরে পরিগণিত ... একি ... [xviii]

কারণ কবি বিশ্বাস করেন,

দিনভর শ্রমিকতা ঈশ্বরের আঙুরবাগানে
সেই ভালো, তার মতো ভালো নেই, তার চেয়ে ভালো
আমার ভালো না। [xix]

পাঠক যখন আশ্বস্ত হন এই ভেবে যে কবি তাঁর বেঁচে থাকার মহতী পথ খুঁজে নিয়েছেন তখন অত্যন্ত আধুনিক প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরহীন সমাজের একশ্রেণীর ভণ্ড প্রতারক, যারা শঠতার আশ্রয়ে আমোদের সঙ্গে জীবননির্বাহ করেন, তাদেরই একজন কবিকে তাদের সঙ্গে একই পংক্তিতে বসিয়ে 'মেকি' বলে মুষ্ট্যাঘাত করে। কবির এ প্রতারণা কি আত্মপ্রতারণা এবং সঙ্গে করে জগৎকে প্রতারণা করা ! এ যেন তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা – বিবেক দ্বারা দংশিত কবি ভুলতে পারেন না তিনিও প্রতারকদের একজন প্রতিনিধি হয়ে নিজের ইমেজ ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়েছেন। এত প্রতারণার মাঝে ঈশ্বরের স্থান কোথায় ! কারণ, শুভবোধের আরেক নামই তো ঈশ্বর ; তিনি তো জগতের মঙ্গলকামী। তবে ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণও কেন জগতের মঙ্গলে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করতে পারে না। এ কি ঈশ্বরেরই অপারগতা, না কি বিষয়ী ভক্তের বিফলতা। এক প্রতারক যখন

অস্থিমাংস থেকে আমার শরীর একটানে
খুলে দিল, 'শীত করছে' বলতেই সেই সংঘাতুর

কাদাপায়ে হাতির দাঁতের গড়া আত্মার আঙুর
দলে গেল, যে টুকু গড়েছিলাম ভোরের বাগানে। [xx]

তখন 'সংঘ' বলতেই পাঠকের মনে সংঘবদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণদের অনুষঙ্গ মনে পড়ে যাঁরা জগৎহিতার্থে আত্মত্যাগ করেন। কিন্তু 'সংঘাতুর' যারা তারা মানসিক পঙ্গুত্বে মেকি জগৎহিতের ব্রতে স্বার্থমগ্ন। কবির অস্থিমাংস থেকে শরীর খুলে নিল একজন সংঘাতুর। এর ফলে যেন পার্থিব অস্তিত্ব থেকে বিদেহী অস্তিত্ব বিযুক্ত হয়ে যায় আর এই বিযুক্ততার ক্ষণেই হাতির দাঁতে গড়া শ্বেতশুভ্র, অমলিন, দৃঢ়, অমূল্য 'আত্মার আঙুর' যা জীবনের শুভকর্মের অর্জন তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

আসলে এ মুহূর্ত আত্মোপলবদ্ধির – বাস্তবের কশাঘাতে নিজের আত্মস্বরূপ খোঁজার ক্ষণ, কারণ মরজগতের কৃতকর্মের যথার্থ বিচারের মানদণ্ডেই সম্ভবত আত্মানুসন্ধান সম্ভব। জাগতিকতা-র গ্লানিতে মগ্ন হলেই ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যবধান রচিত হতে থাকে ; আর আপাতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেহেতু ভক্তগণের বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল, তাই আজকের ঈশ্বর-ও কবির দৃষ্টিতে ভক্তের ভক্তির কৃপাপ্রত্যাশী ভিখারির মতো –

ভিখারী, আপেল হাতে, অবিকল ঈশ্বরের মতো,
সম্ভাষণে কাছে আসি, কিন্তু ব্যবধান বেড়ে যায়। [xxi]

কবি প্রশ্ন, প্রতিপ্রশ্নের নিরিখে সত্যকেই যাচাই করে নিতে চেয়েছেন। যুগোচিত সামাজিক অস্থিরতা, উপশমহীন যন্ত্রণা নিবারণে ঈশ্বরকে অবলম্বন হিসেবে না পাওয়ার অভিমান ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তবু "রক্তাক্ত ঝরোখা"-তে কবি দার্শনিক-ঔপনিষদিক ধারণায় ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী সেটি পরিপুষ্ট করেছেন। এখানে ঈশ্বরকে তিনি আশ্রয়দাতা, প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী, প্রিয়তমা, কবিতার বিষয়বস্তু, ভিখারি, বাটিকে আঁকা দিনশেষের আকাশ, আবিশ্বনিখিল, ইত্যাদি বলে কল্পনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রভাত মিশ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য –

> মানতেই হবে যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে প্রচলিত ভাববাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী তা অলোকরঞ্জনের কবিতায় সুস্পষ্ট। আদি দুই ভাববাদী দর্শন – বিষয়গত ভাববাদ (প্লেটো, শিলিং, হেগেল) ও বিষয়ীগত ভাববাদ (বার্কলে প্রমুখ) নান্দনিক সৃষ্টির বিচার প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়েছে এভাবে : বিষয়গত ভাববাদে বলা হয় শিল্পের সৌন্দর্য নিহিত থাকে পরমসত্তা বা ঈশ্বরের প্রকাশে, যা প্রকাশ পায় বস্তুজগতের উপাদান সম্বলিত রচনার আঙ্গিকে – কবিতার ক্ষেত্রে বলা যায় – উপজীব্য বিষয়ে এবং বাক্যবিন্যাসে। বিষয়ীগত ভাববাদ বলে, শিল্পী তাঁর নিজস্ব কল্পনায় ... প্রকৃতিজগৎ ও চারপাশের বাস্তব জীবনকে জীবন্ত করে তোলেন। শিল্পী শিল্পকর্মে তাঁর চেতনার বিক্ষেপ ঘটান বাইরের জগৎ ও জীবনে, যা প্রতিফলিত হয়, কবিতার ক্ষেত্রে, ভাষায়। [xxii]

"রক্তাক্ত ঝরোখা"-য় অলোকরঞ্জন বিষয়গত ও বিষয়ীগত ভাববাদের মিলন ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে যেমন ঈশ্বর উপজীব্য হয়েছেন, তেমনি তাঁর নিজচেতনার বিক্ষেপও দেখা যায় বারংবার, কারণ ঐশ্বরিক সত্তা আর কবির সত্তা মুখোমুখি অবস্থানে থাকে সর্বদা।

"গিলোটিনে আলপনা" কাব্যের "পুড়ুক আমার কুশপুতুল" অংশের 'দ্ব্যর্থ-আলো' কবিতায় 'ঈশ্বরের ভীষণ-মুখোমুখি' দাঁড়িয়ে অলোকরঞ্জন তাঁর 'নগ্ন', 'পুন্যলতা' কে দেখেন, – যখন তিনি 'প্রথার সপ্তশতী' আর 'সুবচনীর ব্রত' কথার আনুষ্ঠানিকতাকে বর্জন করে, ঈশ্বরকে সমস্ত বহিঃ ও অন্তঃ আবরণমুক্ত করে পারম্যের উৎকর্ষে অক্ষত নক্ষত্রলোকের জ্যোতিপুঞ্জের আলোকে ঈশ্বরীয় অস্তিত্বে তিনশরকমের-সূর্য-রূপে দেখতে চেয়েছেন। কোপার্নিকাসের বিজ্ঞান তত্ত্ব বা প্রথাসিদ্ধ ধর্মতত্ত্ব না মেনে তিনি নগ্ন অথচ প্রচণ্ড-সত্য ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে গিয়ে স্থান ও কালের রূপান্তরকরণে দেখেন যে নগ্ন নারী সাধিকা কমণ্ডলু হাতে টালিগঞ্জের ভিড়ের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে।

সেই পুণ্যশীলা নারী ঘুণ-ধরা তথাকথিত 'ধার্মিক' অর্চনার প্রতীক 'ঘট'-কে অবহেলায় স্পর্ধিত পা দিয়ে ভেঙে দেয়। এই স্পর্ধায় সে সমস্ত 'তথাকথিত' ধার্মিক আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করে উন্মুক্ত ও অনাবিল চিরন্তন সত্যের প্রকাশহেতু নিজ-অস্তিত্বের 'নীল আহুতি' দেয় **।** [xxiii]

এই 'নীল আহুতি' সৃষ্টি রক্ষার্থে মহেশ্বরের বিষ পান করে নিজেকে আহুতি দেওয়ার অনুষঙ্গ মনে করায় । এখানে ঈশ্বরের অস্তিত্বের মাঝেই পুণ্যলতার অস্তিত্ব মিশে গেছে । দুজনের থেকে উৎসারিত দ্ব্যর্থ-আলো কবির চোখে একই আলো হয়ে গেছে । প্রকতঈশ্বর অভিলাষী কবির অন্তঃস্থলে ঘুণে-ধরা-আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করার যে স্পৃহা তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কমণ্ডলু হাতের আত্মদানকারী নারীর মধ্যে ; তাই তিনি সেই আলোকিত নারীর উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন –

কলকাতার ভিড়ের ভিতর থেকে
এখন শুধু তোমায় দেখব আমি । [xxiv]

যেহেতু আধ্যাত্মিকভাবে নারী পুরুষের থেকে বেশী সংবেদনশীল বলে ধারণা করা হয় এবং নারী নিজেও সৃজনক্ষমতার অধিকারিণী তথা সন্তান পালয়িত্রী, তাই বুঝি নারী সহজেই প্রকৃতঈশ্বরের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যান; যেখানে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে নারীর কোনও লজ্জাকর দেহান্তরাল থাকে না, কেবলমাত্র থাকে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। দিগঙ্গনা নারী যেন শক্তিরূপিণী দেবী কালিকারই প্রতিরূপ। ঈশ্বর আর শক্তির মিলিত অস্তিত্বে মনুষ্যসৃষ্ট-তথাকথিত-আনুষ্ঠানিকতা'র কোনও স্থান নেই। ঈশ্বর প্রেরিত প্রকৃত আলোক যা ভক্তসত্তাকে সঠিক দিশা দেখায় তাকে কবি তিনশো সূর্যের আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এখানে তিনশো কেবলমাত্র একটি সংখ্যাই নয়, এ আসলে ঈশ্বরের অনন্ত জ্যোতিরাশিরই ইঙ্গিতবাহী। "যৌবনবাউল" কাব্যের গ্রামীণ অলোকরঞ্জন "গিলোটিনে আলপনা" কাব্যগ্রন্থে পৌঁছে নাগরিক ঈশ্বরকে নিয়ে 'দ্ব্যর্থ-আলো' নামের এই প্রচণ্ড শানিত এবং সপ্রতিভ কবিতা লিখেছেন আবরণহীন উন্মুক্ততার চেতনায়।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন,

He who is in you and outside you,
Who works through all hands,
Who walks on all feet,
Whose body are all ye,
Him worship, and break all other idols!
He who is at once the high and low,
The sinner and the saint,
Both God and worm,
Him worship – visible, knowable, real, omnipresent,
Break all other idols!
In whom is neither past life
Nor future birth nor death,
In whom we always have been
And always shall be one,
Him worship. Break all other idols!
Ye fools! Who neglect the living God,
And His infinite reflections with which the world is full.
While ye run after imaginary shadow,

That lead alone to fights and quarrels,
Him worship, the only visible!
Break all other idols. [xxv]

বিবেকানন্দের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিটি প্রাণের অন্তরে ও বাইরে, প্রতিটি কর্মদীপ্ত হাতে এবং দৃপ্তপদচারণায়। তাঁর মতে ঐশী সত্তার প্রকাশ উচ্চে, নিম্নে, পাপীতে, সাধুতে, ঈশ্বরে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটে সর্বত্র। ঈশ্বর দৃশ্যবান, সত্য, জ্ঞেয় এবং সর্বত্র বিচরণকারী। ঈশ্বর অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের সময়বন্ধনে অর্গলিত নন এবং তাঁর কাছে সৃষ্টির প্রতিটি কণিকাই এক ও অনন্য। জগতের প্রতিটি সৃষ্টিতেই রয়েছে তাঁর প্রতিফলন। তাই সব প্রাণহীন দেবমূর্তিকে ভেঙে ফেলে জীবন্ত ঈশ্বরের অর্থাৎ নরনারায়ণের সেবাই করা উচিৎ। প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনা না করে কাল্পনিক ছায়ার পেছনে দৌড়ালে জাগতিক কলহই কেবল বৃদ্ধি পায়। তাই কেবলমাত্র মানবিক ঈশ্বরের আরাধনাই করা উচিৎ।

তথাকথিত ধার্মিক আনুষ্ঠানিকতার বিরোধিতা কবি অলোকরঞ্জনের 'অপ্রতিষ্ঠ' ("জবাবদিহির টিলা") কবিতাতেও লক্ষ করেন পাঠক। মানুষের পরিচয় যখন তথাকথিত 'ধার্মিক' সম্প্রদায়ের নামের শিলমোহরে অঙ্কিত হয়ে থাকে এবং মানুষ যখন ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে অশ্রদ্ধা করে অপমানিত, লাঞ্ছিত, ধিকৃত, আহত এবং সময়বিশেষে হত্যা করতেও পিছপা হয়না, তখন সমাজসচেতন ইতিহাসমনস্ক কবি অলোকরঞ্জন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মুখ ফেরাতে পারেন না। শুধুমাত্র নিজের অন্তরচেতনে ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন থাকতে পারেন না তিনি। ঈশ্বরের নামের আড়ালে সামাজিক মুখোশধারীদের অন্যায় আচরণে মানবতার পতনে তাঁর আত্মা বিচলিত হয়। এখানে agnostic বা atheist হিসেবে নয়, বরং ধর্মের নামে গোঁড়ামি, হিংসা, প্রতিহিংসা আর প্রতিষ্ঠান-সর্বস্বতার বিরুদ্ধেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি : 'মানুষ কি তবে এতই প্রতিষ্ঠান' ![xxvi] আসলে তিনি বিশ্বাস করেন স্বামী বিবেকানন্দের সেই মহান উক্তিতে যা 'কোয়েস্ট ফর গড' কবিতায় বিবৃত আছে –

'Quest for God'
O'er hill and dale and mountain range,
In temple, church, and mosque,
In Vedas, Bible, Al Koran
I had searched for Thee in vain. …
A flash illuminated all my soul;
The heart of my heart opened wide.
O joy, O bliss, what do I find!
My love, my love you are here
And you are here, my love, my all! …
The moon's soft light, the stars so bright,
The glorious orb of day,
He shines in them; His beauty – might –
Reflected lights are they.
The majestic morn, the melting eve,
The boundless billowing sea,
In Nature's beauty, songs of birds,
I see through them – it is He. …
When holy friendship shakes the hand,
He stands between them too;

He pours the nectar in mother's kiss
And the baby's sweet 'mama'.
Thou wert my God with prophets old,
All creeds do come from Thee,
The Vedas, Bible and Koran bold
Sing Thee in harmony.
'Thou art,' 'Thou art' the Soul of souls
In the rushing stream of life.
'Om tat sat om.' Thou art my God,
My love, I am thine, I am thine. [xxvii]

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেন যে প্রাণের জীবন্ত প্রবাহে, প্রকৃতির সৃষ্টিসম্ভারে, মানবিক তথা আত্মিক সম্পর্কের প্রকাশে, সমস্ত ধর্মে ও ধর্মগৃহে ঈশ্বর আছেন । বিবেকানন্দের উপরোক্ত কবিতায় অলোকরঞ্জনের কবিতার প্রতিধ্বনিই পাঠক শুনতে পান । অলোকরঞ্জনের ঈশ্বরচিন্তা ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী । কিন্তু যেহেতু তিনি সমগ্রকে দেখতে ও উপস্থাপন করতে ভালোবাসেন, সেহেতু এক বৃহৎ সমবায়ী শক্তির ভিতর লুকিয়ে থাকা বৈপরীত্য তাঁর চোখে ধরা দেয় - তাই বিশ্বাসের গহনে অবিশ্বাসের ছায়া আর অবিশ্বাসের কাঠামোয় অন্তরিত বিশ্বাসটুকুকে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর কবিতায় । সত্য তাঁর কাছে একরৈখিক নয়, বরং বহুমাত্রিক । ঈশ্বর, ঈশ্বরহীনতা, নশ্বরতা সম্পর্কিত তাঁর ধ্যানধারণা আসলে সত্যকেই উন্মোচিত করে । তাই যখন কবি বলেন -

'একটু একটু করে অনীশ্বর হয়েছি, এখন অস্থি জুড়ে
প্রেতপিশাচের দল ডম্বরু বাজায় শর্বরীতে -
তথাপি যেহেতু কবে যৌবনবাউল লিখেছিলাম
ঈশ্বরের কথা বলি ভাবমূর্তিটুকু রেখে দিতে ।
(ভাবমূর্তি / সমস্ত হৃদয় শুধু ভূকম্পপ্রবণ হয়ে আছে)' [xxviii]

তখন পাঠক ভাবতে শুরু করেন কবি বোধহয় অজ্ঞেয়বাদ বা agnosticism-এর মতাদর্শী হতে শুরু করেছেন, কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বে তাঁর আর কিছু যায় আসে না, - শুধুমাত্র নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখার দায়বদ্ধতায় তিনি ঈশ্বর নিয়ে কথা বলেন। আসলে যুগোৎসারিত মানবিকতার দৈন্য, বিশেষতঃ, যুদ্ধবিধ্বস্ত শরণার্থীর সান্ত্বনাহীন বেদনা, শুভ মনুষ্যত্ববোধের চরম অপমানে 'যৌবন বাউলের' কবি অভিমানাহত। কিন্তু তিনি নৈরাশ্যবাদী নন। জীবনের অবিরাম নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া জেনেও তিনি ঈশ্বরের দিকে ছুটে যেতে চান। 'দুরকম ছুটে-যাওয়া' ("এবার চলো বিপ্রতীপে") কবিতায় কবি লেখেন -

সুরদাসের প্রার্থনাপদের প্রথম পঙক্তির মতো
ভয়ানক ছোটো, তবু শেষে বেড়ে গিয়ে
নরকরোটির শেষ সম্ভাবনা নিঃশেষিত করে
অনবরত ঈশ্বরের দিকে ছুটে-যাওয়া ... [xxix]

জাগতিক ঈশ্বরবিশ্বাসের শেষ সম্ভাবনাও যখন মৃতপ্রায় হয়ে যায় তখনও অযাচিত কোনও আশ্বাসের ফলে নিজের মনই নিজেকে প্রত্যয়ী করে তোলে । আসলে এ সেই অস্তিত্বের মর্মমূলে আজন্মলালিত ঈশ্বরবিশ্বাস যার ফলে কবির অনবরত ঈশ্বরের দিকে ছুটে চলা চলতেই থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাইরের অবিশ্বাসের কাঠামোয় 'সুরদাসের প্রার্থনাপদের মতো/ ভয়ানক ছোটো' সেই বিশ্বাসের বিন্দুটিকে হৃদয়ে আগলে রেখে জীবন অতিবাহনের সীমিত সময়ে সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত সে-বিশ্বাসকে ব্যাপ্ত করা হচ্ছে অন্যতম একটি সম্ভাবনা। আরেক সম্ভাবনায়

কবি পাঠককে সুরদাস থেকে স্পেনীয় কবি মাচাদো'র কবিতায় মনোনিবেশ করতে প্রলোভিত করেন, যখন তিনি লেখেন –

> অথবা শুরু থেকেই আবেগ ঝরিয়ে তুমি মাতো
> যেমন স্পেনের কবি অন্ধকারে গিটার বাজিয়ে
> ঈশ্বরের সন্ধানে মাচাদো । [xxx]

স্পেনীয় কবি মাচাদো (১৮৭৫ – ১৯৩৯) স্পেনের 'Generation of 98'এর আন্দোলনের অন্যতম পুরোধাপুরুষ ছিলেন । মাচাদো বলেছেন –

> My philosophy is fundamentally sad, but I'm not a sad man, and I don't believe I sadden anyone else. In other words, the fact that I don't put my philosophy into practice save me from its evil spell, or, rather, my faith in the human race is stronger than my intellectual analysis of it; there lies the fountain of youth in which my heart is continually bathing. [xxxi]

মাচাদো নৈরাশ্যবাদী নন। অলোকরঞ্জনও ঠিক তাই। সামাজিক সচেতনতার কবি তিনি। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে বিশ্বব্যাপী আহত মানবাত্মার ক্রন্দনে এবং বেদনায় তিনি জারিত করেছেন। প্রতিবার প্রবাস জীবন থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে সামাজিক অধোগামিতায় অলোকরঞ্জন ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

মাচাদো তাঁর ব্যক্তিগত চেতনার স্তরে ও স্মৃতিময়তায়, বাইরের পৃথিবীর প্রবাহ, প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সমস্ত দ্বান্দ্বিকতার ঊর্ধ্বে সমাজসচেতন কবি হয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতির স্তর থেকে ঊর্ধ্বে উঠে সমগ্রের সামাজিক চেতনায় ও আগামীর দ্যোতনায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন। অলোকরঞ্জনও এভাবেই ব্যক্তিগত মাধ্যম 'আমি' থেকে সমগ্রের মাধ্যম 'তুমি'-তে কবিতার ভাববিস্তার করেছেন আলোচ্য কবিতায়। এই কবিতায় মাচাদো সম্পর্কিত উল্লিখন (allusion)-র ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, মাচাদো ব্যক্তিগত আবেগকে সংযত করে, কঠোর বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে, স্বপ্নে দৃশ্যায়িত আপন হৃদয়ভূমিতে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে দৃঢ়ভাবে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেন। স্বপ্নের কল্পরাজ্যে জীবনসুধা পানের আশ্বাস, অথবা অতীতের ভ্রান্তি হৃদয়মধুতে মিশ্রিত হয়ে যথার্থে পরিণত হওয়ার বিশ্বাস, কিংবা অন্তর্জ্যোতিতে আলোকিত হৃদয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি-কে তাঁর মিথ্যা বলেই মনে হয় । তাই তো 'Last Night As I was Sleeping' কবিতায় স্পেনীয় কবি মাচাদো লেখেন –

> Last night as I slept,
> I dreamt – marvelous error! –
> that it was God I had
> here inside my heart.[xxxii]

অথচ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ক্রমাগত অস্বীকার করার তাগিদে প্রকারান্তরে ঈশ্বর-চিন্তাতেই নিয়োজিত থাকে মানবমন। অবচেতনে লুক্কায়িত ঈশ্বর-ভাবনার প্রকাশ হয় স্বপ্নে । তাই এভাবেও ঈশ্বরের দিকে ছুটে যাওয়া যায় ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ঈশ্বর ও ঈশ্বরহীনতার দ্বৈরথে একটি সমীকরণ খুঁজতে অক্লান্ত। তাঁর এই প্রয়াসলব্ধ ও আত্মসমীক্ষাজাত যে গভীর জীবনবোধ তা দুই অন্তর্বিরোধী ভাবসত্যদ্বয় অর্থাৎ ঈশ্বরমুখিতা ও ঈশ্বরবিমুখিতাকে আয়তনিক সত্যের বিচিত্র প্রকাশরূপেই দেখেছে। তাঁর ভাষায় –

> অনতি-অতিক্রান্ত যুগের কবিরাও কেমন সহজে প্রেম/ অপ্রেম, ঈশ্বর/ নাস্তিকতা প্রমুখ সরল বর্গব্যূহসমূহ রচনা করেছিলেন, তাঁদের প্রতিভাকে ঈর্ষা করলেও তাঁদের প্রবণতা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেনি । [xxxiii]

কারণ,

> ...ঈশ্বরকে আমরা সেদিন আমাদের সামূহিক আস্পৃহার একটি মহান অছিলা হিসাবে নির্বাচন করে নিয়েছিলাম। অথবা এমনও বুঝি হতে পারে ঐশী প্রতীতি থেকে তার ভঙ্গীটুকু আমরা একেবারে আলাদা করে নিইনি। [xxxiv]

জীবনের পথ নানা বিরোধাভাসে সংগঠিত। এইসব বিরোধাভাসকে সঙ্গে করেই স্থির বিষয় ঈশ্বরের দিকে মানব-মনের অহর্নিশ যাত্রা। জীবন-আখ্যানের তথা সত্য-অন্বেষণের নানাবিধ প্রবর্তনা, বহুমাত্রিক অস্তিত্বের নানামুখী প্রকাশভঙ্গিমার বুনোটে প্রত্যায়িত । এর প্রতিটিই অন্বিষ্ট সত্য, এই বৈচিত্র্যের প্রকাশই দেখতে পাওয়া যায় অলোকরঞ্জনের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কবিতাসমূহে । তাঁকে গৎবাঁধা অর্থে ঈশ্বরবিশ্বাসী বা নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী বলা যায়না, কারণ সদৃশ ও বিসদৃশ ধারণার মহাসম্মিলনই তো জীবনসত্য। তাঁর ঈশ্বর ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক ভক্তিবাদের অনেক ঊর্ধ্বে বিরাজিত জ্যোতির্ময় অম্লান, এবং পরম সত্যস্বরূপ ।

তথ্যসূত্র :

[i] অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'স্বীকারোক্তি', "গদ্যসমগ্র ২", কলকাতা : (প্রতিভাস, ২০০৯), ৪৯৮ । Print.

[ii] ঋতম্ মুখোপাধ্যায়, 'অলোকরঞ্জনের কবিতা : ঈশ্বরের চিঠি', "কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : এক মেধাবী বাউল", কলকাতা : (ভাষা ও সাহিত্য, ২০১১), ১৩ । Print.

[iii] অলোকরঞ্জন, 'বন্ধুরা বিদ্রূপ করে', "যৌবনবাউল", "কবিতাসংগ্রহ" প্রথম খণ্ড, কলকাতা : (দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫), ৫৩ । Print.

[iv] <www.shaivam.org/hipgodco.htm>, accessed on 03-12-2015. Web.

[v] অলোকরঞ্জন, "কবিতাসংগ্রহ" প্রথম খণ্ড, ৬৫ । Print.

[vi] তদেব, ১১২ । Print.

[vii] তদেব । Print.

[viii] অলোকরঞ্জন, "গদ্যসমগ্র ১", কলকাতা : (প্রতিভাস, ২০০৭), ২৫৫ । Print.

[ix] অলোকরঞ্জন, "কবিতাসংগ্রহ" প্রথম খণ্ড, ১১২ । Print.

[x] অলোকরঞ্জন, তদেব, ৮০ । Print.

[xi] "'God' in Upanishads", <www.infinityfoundation.com/God.pdf>, accessed on 03-12-2015. Web.

[xii] অলোকরঞ্জন, 'তুমি কি চেয়েছ শুধু নম্র নবনীত ?', "নিষিদ্ধ কোজাগরী", "কবিতাসংগ্রহ" প্রথম খণ্ড, '১৭২ । Print.

[xiii] অলোকরঞ্জন, "গদ্যসমগ্র ১" ২৫৫ । Print.

[xiv] গ্রন্থপ্রসঙ্গ, "কবিতাসংগ্রহ" প্রথম খণ্ড, ২৭৮ । Print.

[xv] <http://www.poemhunter.com/poem/dover-beach/>, accessed on 03-12-2015. Web.

[xvi] অলোকরঞ্জন, "নিষিদ্ধ কোজাগরী", "কবিতাসংগ্রহ" প্রথম খণ্ড, ১৬৩ । Print.

[xvii] <http://www.potw.org/archive/potw351.html>, accessed on 03-12-2015. Web.

[xviii] অলোকরঞ্জন, "রক্তাক্ত ঝরোখা-১", "কবিতাসংগ্রহ" প্রথম খণ্ড, ২১৬ । Print.

[xix] "রক্তাক্ত ঝরোখা-৩", তদেব, ২১৭ । Print.

[xx] তদেব । Print.

[xxi] "রক্তাক্ত ঝরোখা-৬", তদেব, ২১৮। Print.

[xxii] শাওন নন্দী, "পঞ্চাশ: কবিতার নয়াচর", কলকাতা : (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০১), ১৪৪। Print.

[xxiii] অলোকরঞ্জন, "গিলোটিনে আলপনা", কবিতাসংগ্রহ" দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : (দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭), ২৩। Print.

[xxiv] তদেব। Print.

[xxv] <http://www.poemhunter.com/poems/god/page-1/30882378>, accessed on 03-12-2015. Web.

[xxvi] 'অপ্রতিষ্ঠ', "জবাবদিহির টিলা", "কবিতাসংগ্রহ" দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৬ – ১২৭। Print.

[xxvii] <http://www.poemhunter.com/poems/god/page-1/17023498/>, accessed on 03-12-2015. Web.

[xxviii] ঋতম্ মুখোপাধ্যায়, "কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : এক মেধাবী বাউল", কলকাতা : (ভাষা ও সাহিত্য, ২০১১), ২২ – ২৩। Print.

[xxix] "কবিতাসংগ্রহ" দ্বিতীয় খণ্ড, ২৩০। Print.

[xxx] তদেব। Print.

[xxxi] <https://www.goodreads.com/author/quotes/34610.Antonio Machado>, accessed on 04-12-2015. Web.

[xxxii] <www.poemhunter.com/poem/last_night_as_i_was_sleeping>, accessed on 04-12-2015. Web.

[xxxiii] "গদ্যসমগ্র ২", ৪৯৬। Print.

[xxxiv] তদেব, ৪৯৭। Print.

গ্রন্থপঞ্জি

- দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন। "কবিতা সংগ্রহ" প্রথম খণ্ড। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫।
- ---। "কবিতা সংগ্রহ" দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭।
- ---। "গদ্যসমগ্র ১"। কলকাতা : প্রতিভাস, ২০০৭।
- ---। "গদ্যসমগ্র ২"। কলকাতা : প্রতিভাস, ২০০৯।
- নন্দী, শাওন। "পঞ্চাশ : কবিতার নয়াচর"। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০১।
- মুখোপাধ্যায়, ঋতম্। "কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : এক মেধাবী বাউল"। কলকাতা : ভাষা ও সাহিত্য, ২০১১।